

মহাপীঠ তারাপীঠ

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরে কাছই মন্দির নগরী মহাপীঠ তারাপীঠ। মা তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রে জন্ম বর্ষিষ্ঠ এই সিদ্ধপীঠ। কটাক্ষী অমাবস্যা তথিতি কঠোর তপস্যায় আশীর্ভূত ফল মিলে। সাধক কুলকুণ্ডলীক জয় করতে পারে। কথিত আছে, একবার দেবীর মাতৃরূপ দর্শন চান বর্ষিষ্ঠ মুনি। দেবীও নরিশ করনেন। মাতৃরূপে দর্শন দেন দেবী। এখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন তারামায়ের ভক্ত বামাক্ষ্যাপা। ফলে এটি সিদ্ধ পীঠ হিসেবেও পরিচিতি। তারাপীঠ মহাশ্মশানরে শব্দে শম্মিল গাছের নটি বসে সাধনা করেন সাধক বামদেব। কটাক্ষী অমাবস্যায় তন্তর মতে এই রাতকে 'তারার রাত্রি'ও বলা হয়। এক বিশেষ মুহূর্তে স্বর্গ ও নরক দুইয়ের দরজা মুহূর্তের জন্ম খোলে ও সাধক নজিরে ইচ্ছা মতো ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক শক্তি সাধনার মধ্যে আত্মস্থ করেন ও সিদ্ধিলাভ করেন। কালাকৈ শুমাত্র মাতারা রূপে নয়, রাজরাজেশ্বরী, একজটা বা নীল সরস্বতী রূপেও পূজা করা হয়। সমুদ্রমন্থনের সময়, বিপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন মহাদেব। তাকে স্তন্যপান করিয়ে বিষ্মকৃত করেছিলেন তারা। তারাপীঠের তারা মা উগ্রতারার রূপেই পূজিত হন। এছাড়া এখানে তন্তর অনুসারে ব্রহ্মের সাধনা করা হয় দ্বিতীয় মহাবিদ্যায় তারার রূপ। পীঠস্থানগুলির মধ্যে তারাপীঠ একটি "সিদ্ধপীঠ", অর্থাৎ এখানে সাধনা করলে সাধক জ্ঞান, আনন্দ ও সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তারাদেবী শ্মশানক্ষেত্রে ভীষণা বেশে বামাক্ষ্যাপাকে দর্শন দিয়ে তাকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন।

মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবীমূর্তি সংস্থাপিত— শবিকে স্তন্যপানরতা তারার মূল প্রস্তরমূর্তিটি একটি 3-4 ফুট উঁচু ধাতব মূর্তির মধ্য দিয়ে রাখা থাকে। দর্শনার্থীরা সাধারণত খাতব মূর্তিটিই দর্শন করে থাকেন। এই মূর্তিটি তারার দেবীর ভীষণা চতুরভুজা, মুণ্ডমালাধারিণী এবং লোলজিহ্বা মূর্তি। এলোকেশী দেবীর মস্তকে রৌপ্যমুকুট থাকে। বহিরমূর্তিটি সাধারণত শাড়ি-জড়ানো অবস্থায়, গাঁদা ফুলের মালায়, ঢাকা অবস্থায় থাকে। মূর্তির মাথার উপরে থাকে একটি রূপের ছাতা। মূর্তিটির কপালে সাদুর লপা থাকে। পুরোহিতেরা সেই সাদুরের ঢাকা পরিয়ে দেন দর্শনার্থীদের। প্রত্যেকটি বিগ্রহের নটি গোলকার বন্দীতে দুটি রূপের পাদপদ্ম থাকে। ভক্তরা নারকেল, কলা বা রশেমি শাড়ি দিয়ে দেবীর পূজা দেন।

তারাপীঠে শব চন্দ্রচূড়, হিসেবে পূজিত হন। মন্দিরচত্বর থেকে প্রায় তিন ফুট ওপরে পশ্চিমমুখী মন্দিরটি অবস্থিত। শহরের এক কোণে নদীর ধারে ঘন অরণ্যে বেষ্টিত তারাপীঠ শ্মশানটি অবস্থিত। শ্মশানটি লোকালয় থেকে দূরে। তারাপীঠের শ্মশানটি শব্দে পীঠের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, তারা দেবীকে শ্মশানরে অধিকারে বলপ্রদত্ত ছাগের রক্ত পান করতে দেখা যায়।

তন্ত্রসাধকরা বিশ্বাস করেন নরকঙ্কাল ও শ্মশানক্ষেত্রে তারা দেবীর বিশেষ প্রিয়। দেবীর যে সকল চিত্র আঁকা হয়, তাতে তাকে শ্মশানক্ষেত্রে নবিসানী রূপেই দেখানো হয়। এই কারণে তন্ত্রসাধকরা শ্মশানক্ষেত্রেই তাদের সাধনস্থল হিসেবে বেছে নেন। অনেক সাধুই পাকাপাকিভাবে এখানে বাস করেন। শ্মশানে অনেক জটিল ভূমিকা সাধু দেখা যায়। তারা বটকৃষ্ণের ভলায়, নজিরের কুটির সৃজন করে বাস করেন। এই সব কুটিরের মাটির দেওয়ালে তারা সাদুরমাখানো নরকপাল গ্রথিত করে রাখেন। কুটিরের দেওয়ালে শোভা পায় গাঁদার মালায়, শোভিত হিন্দু দেবী ও তারাপীঠের সন্তদের ছবি। কুটিরের প্রবেশ পথের কাছে অনেক সময়েই মাল্যযুক্ত ত্রিশূল ও নরকপাল রয়েছে দেওয়া হয়। তন্ত্রসাধনা, মানুষ ছাড়াও সাপ, বজ্রশিখাল, হনুমান ও চন্দ্রালরে ক্রোট প্রয়োজন হয়। এগুলির পাশপাশি সাপের খোলসও কুটিরের রাখা থাকে। ভাল নরকপাল পূজা ও স্তন্যপানের জন্ম ব্যবহৃত হয়। কুমারী মেয়ে ও আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিদের মাথার খুলির অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা হয়।

নাগার্জুন / বর্ষিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি এখানে তারাদেবীর তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি অসফল হন। তখন তিনি বিষ্ণুর অবতার ভগবান বৃদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভগবান বৃদ্ধদেব তাকে বামমার্গে মধ্যমাসাদি পঞ্চমকার সহ তারাদেবীর মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সাধনা করতে বলেন। এই সময় ভগবান বৃদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানতে পারেন যে- শবিকে স্তন্যপানরতা তারাদেবী মন্দিরে প্রস্তরীভূত তারামূর্তি তারাপীঠে গুপ্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। তখন ভগবান বৃদ্ধদেবের উপদেশক্রমে নাগার্জুন / বর্ষিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি তারাপীঠে এসে পঞ্চমকার সাধন পদ্ধতিতে 3 লক্ষ বার তারাবীজ ও গাযত্রীমন্ত্র জপ করেন এবং তাতে তারাদেবী প্রীত হয়ে নাগার্জুন / বর্ষিষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হন। নাগার্জুন / বর্ষিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি দেবীকে অনুরোধ করেন যে তার গুরুদেব "ভগবান বৃদ্ধ" যেন □--- শবিকে স্তন্যপানরতা তারাদেবীকে ধ্যান দিতে দেখেছিলেন, দেবী যেন সেই রূপেই তাকে দর্শন দেন। দেবী সেই রূপেই বর্ষিষ্ঠকে দর্শন দেন এবং গুপ্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরীভূত মূর্তিটি প্রকট হয়। মা তারার সাক্ষাৎ দর্শনের পর থেকে নাগার্জুন / বর্ষিষ্ঠ নামক এক ব্যক্তি "বর্ষিষ্ঠমুনি" রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে এবং সেই থেকে তারাপীঠ মন্দিরে শবিকে স্তন্যপানরতা মূর্তিতে দেবী তারা পূজিত হয়ে আসছেন। রসায়নাচার্য নাগার্জুন ভগবান বৃদ্ধদেবের নকিট হইতে দেবী তারার সাধনপদ্ধতি ভারতে নথি আসেন বলে মনে করা হয়। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের সাথে বাংলায় বৌদ্ধ দেবী তারার সাধনা দশমহাবিদ্যার তারা সাধনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং রসায়নাচার্য নাগার্জুন দশমহাবিদ্যার - তারাবিদ্যায় সিদ্ধিলাভের পর বর্ষিষ্ঠমুণিতে পরিণত হন।

(বলা বাহুল্য-- যেন বদে / উপনিষদে/শ্রীরামচন্দ্র দেবের গুরুদেব যেন ভগবান ব্রহ্ম বর্ষিষ্ঠশিষ্য বর্ষিষ্ঠ এরকম লেখা আছে, সেই ব্রহ্ম বর্ষিষ্ঠশিষ্য বর্ষিষ্ঠ তারাপীঠে সাধনা করেননি। তারাপীঠে যেন বর্ষিষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তিনি ভগবান বৃদ্ধদেবের শিষ্য বর্ষিষ্ঠ মুনি)

এই মন্দির ও শ্মশান একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত। তারাপীঠ এখানকার "পাগলা সন্ন্যাসী" বামাক্ষ্যাপার জন্ম ও প্রসিদ্ধি। বামাক্ষ্যাপা এই মন্দিরে পূজা করতেন এবং মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রে কলৈসপতি বাবা নামে এক তন্ত্ররিকের কাছে তন্ত্রসাধনা করতেন। বামাক্ষ্যাপা তারার দেবীর পূজাতেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মন্দিরের অদূরেই আটলা গ্রামে তাঁর আশ্রম অবস্থিত।

তারাপীঠ বীরভূম জেলার তারাপীঠ থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোটো গ্রাম। এটি দুবারকা নদীর তীরে অবস্থিত। প্লাবন সমভূমির সবুজ ধানক্ষেত্রে মধ্য এই তীর্থস্থান অবস্থিত। কিছুকাল আগেও বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মছোপুকুরে ভরা গ্রামের থেকে তারাপীঠে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। বর্তমানে অবশ্য তীর্থসমাহতময়ের কারণে প্রচুর জনসমাগম হওয়ায়, গ্রামটি ছোটোখাটো শহরের আকার নিয়েছে।

বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভ

দীক্ষা গ্রহণের জন্ম মায়ের অনুমতি প্রয়োজন। পাগল বামা তাঁর মায়ের নকিট থেকে অনুমতিলাভ করে তারাপীঠে ছুটে এসে তারা মাকে বললেন, "আমি এসেছি মা, মায়ের অনুমতি নিয়েই এসেছি। এবার তোর পদতলে স্থান দে মা। জয় তারা! জয় তারা! জয় মা তারা!"

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কলৈসপতি বাবা। দূর থেকে ভেসে আসছে " জয় তারা জয় মা তারা " ধ্বনি। তিনি বৃদ্ধত

পারলনে কে আসছে। অনুমান মথিয়া নয় কলৈসপতি বাবার। একটু পরেই তিনি দেখতে পেলেন বামাচরণকে। বামাচরণকে বুক জড়িয়ে ধরলেন কলৈসপতি বাবা। তারপর তিনি বামাচরণকে নিয়ে গেলেন আপন কুটিররে সামনে। কুটিররে অভয়নৃত্রে স্থাপতি মাতৃ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে গভীর বস্মিয়ে হতবাক হয়ে পরলেন বামাচরণ। চারদিকে এতো অন্ধকার, তাহলে কুটির মধ্যে এতো আলো কেন?

অপলক দৃষ্টিতে মাতৃ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন বামাক্ষ্যাপা। তিনি দেখলো, পলকে পলকে রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে মাতৃ মূর্তি। এ দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কেবল উপলব্ধি করতে হয় অন্তর দিয়ে। মায়ের পরিবর্তিত রূপগুলো স্বচক্ষে দেখতে পেলেন বামাচরণ। দেখলেন মায়ের দশটি রূপঃ "কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, ছিন্মিনমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।"

নয়ন সারথক হলো বামাচরণের। অব্যক্ত আনন্দে সারা দেহ তাঁর দুলতে লাগলো। চৈতন্য হয়ে পড়লো আচ্ছন্ন। তারপর এক সময় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

কলৈসপতি বাবার কথায় মোক্ষদানন্দ বদে পাঠ করে শোনতে লাগলেন বামাচরণকে। বামাচরণের দীক্ষা সম্পন্ন হলো। বামাচরণ এক এক করে শিখে নিলো ধর্ম, শাস্ত্র ও নীতি। ভৈরব-তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ শিখে হলে বামাচরণের। কলৈসপতি বাবা এবার বামাচরণকে নিয়ে এলেন শ্বতে শম্মিল বৃক্ষতলে পঞ্চমুন্ডির আসনে। বললেন "এ আসনে তুমি ধ্যানবেস। একাকী নির্ভয়ে জপ কর বীজমন্ত্র।" ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠমুনি, এই আসনে বসে তারা মন্ত্রের সাধনা করেন ও সিদ্ধিলাভ করেন, তারা মায়ের দর্শন করেন। তারপর আরও অনেকে সাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তান্ত্রিক সাধক আনন্দ-নাথ, পণ্ডিত মোক্ষদানন্দ, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ আরও অনেকে এই পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেন।

কৌশিকী অমাবস্যা তথিতে বামাচরণ ধ্যানবেসলেন। ধীরে ধীরে লোপ পেলো বশি-চরাচর যাবতীয় অনুভূতি। দিন শেষ হয়ে নামে সন্ধ্যা। তারপর আসে রাত্রি। পৃথিবীতে কোথাও কোন কোলাহল নেই। যেন অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে পৃথিবী। বামাচরণ তখন বাহ্যজ্ঞানহীন। জাগতিক সমস্ত সত্তা তার তখন বলিষ্ঠ হয়েছিল। অবশেষে দিনমণি উদয় হয়। দগ্নিত হয়ে ওঠে রঞ্জন। এমন সময় বামাচরণ শুনতে পেলেন এক নারীকন্ঠের ডাক, "বামা! তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। পূরণ হয়েছে তোর প্রার্থনা। এই বৃক্ষমূলে আমি শিলাময়ী রূপে অধিষ্ঠিত রয়েছি। তোর সিদ্ধিলাভের প্রমাণস্বরূপ আগামী এক প্রহরের মধ্যে ধরাশায়ী হবে এই শ্বতে শম্মিল বৃক্ষ।"

চমকে উঠলো বামাচরণ। ভয়ে বললেন "সেকি মা, এই শ্বতে শম্মিল বৃক্ষ ধরাশায়ী হবে?"
হসে উঠলো তারা-মা। বললেন "হ্যাঁ ধরাশায়ী হবে। আর এখন থেকে এই বৃক্ষের বদলে মহাজ্যোতিষ্ক রূপে আমি স্বয়ং এখানে বিরাজ করবো। তোর সিদ্ধিলাভের পর মাত্র তিন লক্ষবার মন্ত্রজপ করে এই কলিযুগে এখানে সিদ্ধিলাভ করবে একাদশ সহস্র সাধক।"

তারা-মায়ের কথা কি মথিয়া হতে পারে? ঠিক এক প্রহর মধ্যে ধরাশায়ী হলো শ্বতে শম্মিল বৃক্ষ। আর তৎক্ষণাৎ সেই স্থান অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোয় প্রকাশিত হলো এক নীলবর্ণ নারীমূর্তি। সেই মূর্তির বামপদ শবের উপর স্থাপিত, বামহস্তে নীলপদ্ম ও কপাল-পাত্র, ডান-হস্তে খড়্গ। দেবীর পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, গলায় মহাশঙ্খমালা, মস্তকে পিঙ্গল বর্ণের জটাজাল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। বামাচরণ চিন্তে পারলো এই মূর্তিকে। ইনহি তাঁর আরাধ্যা দেবী- তারা-মা।

তারা-মা সস্নেহে দু'হাত প্রসারিত করলেন। বৃক্ষে টেনে নিলেন পাগল সন্তান বামাচরণকে। আত্মার সংগে পরমাত্মার সংযোগ স্থাপিত হলো। জগতে বামাচরণ সুপ্রচিতি হলেন 'বামাক্ষ্যাপা' নামে।

১২৭৪ বঙ্গাব্দে কৌশিকী অমাবস্যা তথিতে তারা-মহাশ্মশানে শ্বতে-শম্মিল বৃক্ষের নীচে তারা মায়ের প্রিয় পুত্র সাধক বামদেবে পরম সিদ্ধিলাভ করেন এবং তারা মা বামাচরণকে চরিত্রের জন্য স্থান দলিলে তাঁর শ্রীচরণকমলে। শিষ্যের সিদ্ধিলাভে খুশি হলেন গুরু কলৈসপতি বাবা।

জয় তারা জয় বামা। জয় জয় তারা জয় জয় বামা।

ভাদ্র মাসের অমাবস্যা কে কৌশিকী অমাবস্যা বলা হয়ে থাকে। এদিন তন্ত্র ক্রিয়ার বিশেষে সফলতার জন্য তথিখি মাহাত্ম্যে এতটাই বেশি যে হাজার হাজার ভক্ত তারা-মহাশ্মশানে ছুটে যান।

মা তারা হলেন দশ মহাবিদ্যার মধ্যে দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। কৌশিকী হল মা তারারই বিশেষ রূপ। রং কালো হওয়ার জন্য ভোলনোথ নাম দেন কৌশিকী। কথিত আছে কৌশিকী অমাবস্যার দিনে তারা-মহাশ্মশানে শ্বতে শম্মিল বৃক্ষের তলায় সাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই বিশেষভাবে পালিত হয় এই অমাবস্যা তথি।

বলা হয় এই অমাবস্যা তথিখি একটা বিশেষ সময়ে স্বর্গ এবং নরকের উভয় দিকের দ্বার খুলে যায়। সাধক যদেকি যেতে চান মহা শক্তি তাকে সেকিই আকর্ষণ করে। এই অমাবস্যার রাত্রি খুব বিশেষ, তন্ত্র ক্রিয়া করলে সেটা বেশিভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত হয়। এবং এই দিনের তন্ত্র ক্রিয়া বিশেষ শক্তিশালী। তাই এদিন তারা-মহাশ্মশানে খুবই ভিড় থাকে, সাধনার শ্রেষ্ঠ সময় হল ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যার এই বিশেষ রাত্রি। এই বিশেষ তথিখি সঙ্গে তারা-মহাশ্মশানে এক গভীর যোগ রয়েছে। কারণ, এদিন তন্ত্র সাধনা, যোগ্য বা মনের কোনও ইচ্ছা পূরণ করার তথিখি।